৪৭তম লিখিত বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা

বাংলাদেশ : ৪ + মানসিক দক্ষতা : ২

মোট সময় : ২ ঘন্টা

[দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে]

বাংলাদেশ-৪ (৫০)

[খাতায় উত্তর লেখার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই প্রশ্নের ক্রমানুসারে উত্তর লিখতে হবে; অন্যথায় উত্তর মূল্যায়নযোগ্য হবে না।]

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন : **নম্বর** ৫×১০ = ৫০

**** নির্দেশনা :**

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে, প্রয়োজনীয় ডেটা, গ্রাফ, চার্ট এবং রেফারেন্সসহ তথ্যবহুল উত্তর করলে সর্বোচ্চ ৭-৭.৫ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ৩-৪, এভারেজ নম্বর ৫-৬।

iii. ভুল ডেটা প্রদান করলে তা কেটে সঠিক ডেটাটি লিখে দিবেন।

iv. প্রতিটি প্রশ্নে ২/৩টি মন্তব্য লিখে দিবেন।

v. খাতার প্রথম বা শেষ পৃষ্ঠায় ৫/৬টি মন্তব্য লিখে দিবেন।

১. পররাষ্ট্রনীতি বলতে কী বোঝেন? গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে কী কী নতুন সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে? আলোচনা করুন।

নমুনা উত্তর : পররাষ্ট্রনীতি হলো একটি রাষ্ট্রের অন্য রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিচালনার নীতি। এই নীতির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি, মূল্যবোধ প্রচার এবং কূটনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে অটোভন বিসমার্ক বলেন- "Extension of domestic policy is the foreign policy. "

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি হচ্ছে- "সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়।"

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫নং অনুচ্ছেদে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে- "জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি।"

গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার চিত্র:

মানবাধিকার লঙ্ঘন ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া: ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের বিক্ষোভ চলাকালীন গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তদন্ত করার জন্য জাতিসংঘ মানবাধিকার কার্যালয় (OHCHR), ইউনিসেফ এবং যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসসহ আন্তর্জাতিক মহল থেকে জোরালো তাগিদ এসেছে। বিশেষ করে, ইউনিসেফ শিশু সুরক্ষা, মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য একটি স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক চাপের মাত্রা নির্দেশ করে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও বিচারহীনতা: আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে গণপিটুনিতে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা (সংখ্যা: ১২৮ জন) গত বছরের দ্বিগুণ বা তারও বেশি। এই উচ্চ পরিসংখ্যানটি অভ্যুত্থানের পরেও দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির দুর্বলতাকে তুলে ধরে, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা: বিগত সরকারের পতনের পর (৫-৭ আগস্ট, ২০২৪) উত্তরাঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ৭০টিরও বেশি পরিবারের ওপর হামলা, লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাগুলো দেশের ভেতরে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুতর ব্যর্থতা নির্দেশ করে।

গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার: অন্যদিকে, অন্তর্বর্তী সরকার গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থার প্রতি অটল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং স্বাধীন, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রস্তুতির কথা জানিয়ে আন্তর্জাতিক মহলকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে।

এ সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য দেশের গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি আন্তর্জাতিক আস্থা পুনরুদ্ধারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন-

জাতি ও গণতন্ত্রের প্রতি আহ্বান: ড. ইউনূস বারবার "প্রত্যেক নাগরিককে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে এক কণ্ঠে কথা বলার" আহ্বান জানিয়েছেন (জানুয়ারি ২০২৪)। এটি দেশের অভ্যন্তরীণ নৈতিক ভিত্তি মজবুত করার গুরুত্বকে তুলে ধরে।

সরকারের লক্ষ্য ও নৈতিক ভিত্তি: প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে তিনি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার স্বপ্নপূরণে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, "নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে সুযোগ ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করলাম, আমরা আমাদের মতানৈক্যের কারণে সেটা যেন হাতছাড়া না করে ফেলি এটা আমরা নিশ্চিত করতে চাই।" এই বক্তব্য গণঅভ্যুত্থানের নৈতিক শক্তি দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা এবং নতুন শাসনের বৈধতা পুনর্গঠনের লক্ষ্যকে সমর্থন করে।

আন্তর্জাতিক নিশ্চয়তা: জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে (UNGA) ড. ইউনূস গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থার প্রতি অটল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি স্বাধীন, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রস্তুতির কথা জানিয়ে বিশ্বনেতাদের কাছে একটি শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরেন, যা আন্তর্জাতিক আস্থা পুনরুদ্ধারে সহায়ক।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এই অঙ্গীকার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন সম্ভাবনা যেমন সৃষ্টি করেছে, তেমনি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই একাধিক জটিল চ্যালেঞ্জও তৈরি করেছে।

➢ **নতুন সম্ভাবনা :** গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানকে মজবুত করার একাধিক পথ খুলে দিয়েছে। যেমন-

* আন্তর্জাতিক সমর্থন ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি: গণতন্ত্র ও সুশাসনের প্রতি সরকারের নতুন অঙ্গীকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আস্থা বৃদ্ধি করবে। এটি বাংলাদেশের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে সহায়তা, ঋণ এবং বিশেষত উন্নয়নমূলক বিনিয়োগের নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে।

* **কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার:** এই প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশকে বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর (যেমন—পশ্চিমা দেশগুলো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন) কাছাকাছি আনতে সাহায্য করবে। এর ফলে সম্পর্ক জোরদার হবে, যা দেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

* **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি:** মানবাধিকার এবং সুশাসনের ওপর জোর দেওয়া দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করবে। বিশেষ করে, পশ্চিমা দেশগুলো এখন সরবরাহ শৃঙ্খলে (Supply Chain) এমন অংশীদার খুঁজছে, যারা পরিবেশগত, সামাজিক ও সুশাসন (ESG) মানদণ্ড মেনে চলে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে কমপ্লায়েন্সের অগ্রগতি এই সুবিধা দেবে এবং উচ্চ মূল্যের খাতেও বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তা করবে।

➢ **নতুন চ্যালেঞ্জ :** নতুন সম্ভাবনা সত্ত্বেও, এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং এর ফলশ্রুতিতে পররাষ্ট্রনীতিতে বেশ কিছু কঠিন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন-

* **অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ও সংঘাত:** গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পথে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। রাজনৈতিক বিভেদ, পুরনো প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রতিরোধ, এবং সমাজের বৈষম্য দূর করার মতো অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো পররাষ্ট্রনীতির কার্যকারিতাকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে। যেমন—রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আস্থা হারাবেন।

* **নীতিগত ভারসাম্য বজায় রাখা:** পররাষ্ট্রনীতিতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো বাহ্যিক প্রত্যাশা (যেমন—মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মান) এবং অভ্যন্তরীণ বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। অভ্যুত্থানের পর কাঠামোগত শূন্যতা, নৈতিক সংকট এবং বৈধতার সংকট কাটিয়ে ওঠা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া, যা আন্তর্জাতিক মান পূরণ করাকে কঠিন করে তুলতে পারে।

* **আন্তর্জাতিক চাপের মোকাবিলা:** মানবাধিকার লঙ্ঘনের অতীত ও বর্তমান অভিযোগের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে জাতিসংঘের মতো সংস্থাগুলোর চাপ আরও বাড়তে পারে। এই চাপ সামলানো এবং একইসঙ্গে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের ঝুঁকি মোকাবিলা করা সরকারের জন্য একটি কঠিন কূটনৈতিক পরীক্ষা।

* **বহুমুখী কূটনীতি বজায় রাখা:** ভূ-রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ চীন ও ভারতসহ বৃহৎ পরাশক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রে রয়েছে। নতুন পরিস্থিতিতে, কোনো একক শক্তি বা ব্লকের প্রতি অতি-নির্ভরশীল না হয়ে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং ভারসাম্যমূলক পররাষ্ট্রনীতি বজায় রাখা জরুরি। LDC থেকে উত্তরণের পর শুল্ক সুবিধা ধরে রাখা এবং আন্তর্জাতিক চুক্তিতে ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য শক্তিশালী কূটনৈতিক দক্ষতা প্রয়োজন হবে।

* **বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ:** গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পুনরুদ্ধার একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। যদি জনগণের সাধারণ ইচ্ছা কার্যকর নীতি ও প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত না হয়, তবে জনগণের আস্থা ক্ষয় হতে থাকবে এবং নতুন শাসনের বৈধতা নিয়ে সংকট তৈরি হবে, যা আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

পরিশেষে বলা যায়, গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের জন্য আত্মমর্যাদা ও জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে একটি নতুন, আত্মনির্ভরশীল ও সম্মানজনক পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের সুযোগ এনে দিয়েছে। তবে এই নীতি তখনই সফল হবে, যখন সরকার অভ্যন্তরীণভাবে গণতন্ত্রকে সুসংহত করে এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণ করতে পারবে।

২. **বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন কীভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে? বিশ্লেষণ করুন।**

নমুনা উত্তর : বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রা আজ কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সীমায় আটকে নেই; বরং এটি সামাজিক ন্যায়, লিঙ্গসমতা ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের সমন্বিত প্রক্রিয়া। এই প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন (Women's Empowerment) বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই ক্ষমতায়ন মানে শুধু সুযোগ পাওয়া নয়, বরং নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে, সম্পদের নিয়ন্ত্রণে এবং সমাজে মর্যাদার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। নারীর এই অগ্রগতি মূলত তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে দেশের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে।

১. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে নারীর অপরিহার্য ভূমিকা : নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি দিয়েছে।

* **জাতীয় অর্থনীতির মূল স্তম্ভ:** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS, ২০২২) তথ্যানুসারে, নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার ৪২.৬৮%। দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪% আসে তৈরি পোশাক (RMG) শিল্প থেকে, যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের ৮০% নারী (UN Women, 2024)। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, নারীশক্তি জাতীয় অর্থনীতির প্রাণশক্তি।

* **দারিদ্র্য হ্রাসে সরাসরি অবদান:** ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা উদ্যোক্তা হয়ে উঠছেন। এতে পরিবারে আয় বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা ও শিক্ষার মতো খাতে বিনিয়োগ বেড়েছে—যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG 5 ও 8)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীরা পরিবারে ব্যয়ের অগ্রাধিকার, সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হচ্ছে, যা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বাস্তব রূপ।

* **মজুরি বৈষম্য ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি:** নারীর অর্থনৈতিক ভূমিকা বিশাল হলেও, তাদের ৯৬% এখনো অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে যুক্ত (UN Women 2024), ফলে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা সীমিত। একই কাজের জন্য নারী শ্রমিকরা পুরুষদের তুলনায় গড়ে কম মজুরি পাচ্ছেন (পুরুষ ১৮৪ টাকা, নারী ১৭০ টাকা), যা তাদের অবমূল্যায়নের ইঙ্গিত বহন করে।

২. সামাজিক সংস্কার ও সচেতনতা বৃদ্ধি : নারীর ক্ষমতায়ন সামাজিক রীতিনীতি, সচেতনতা ও ন্যায়বিচারে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে।

* **শিক্ষার বিপ্লব ও আত্মবিশ্বাস:** ২০১০–২০২৩ সময়কালে বাংলাদেশের নারী সাক্ষরতার হার ৫৫% থেকে বেড়ে ৭৫%-এ পৌঁছেছে (BANBEIS, 2023)। শিক্ষার এই ব্যাপক প্রসার নারীদের আত্মবিশ্বাস, সামাজিক অংশগ্রহণ ও সচেতনতা বহুলাংশে বাড়িয়েছে। ইউনিসেফের তথ্যমতে, মা শিক্ষিত হলে শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা ২.৫ গুণ বেশি থাকে, যা সমাজে শিক্ষার চক্রকে শক্তিশালী করে।

* **লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন:** নারীর আর্থিক সক্ষমতা সমাজে তার মর্যাদাকে উন্নত করেছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে—প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এই ধারণা যে, "অর্থনৈতিক অবদান মানে সামাজিক সম্মান"। এই সক্রিয়তা গ্রামীণ সমাজেও নারীর আত্মনির্ভরশীলতার প্রতীক হিসেবে কাজ করছে।

* **পারিবারিক কল্যাণ ও পুষ্টি:** ক্ষমতায়িত নারী পরিবারে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিশুর পরিচর্যার বিষয়ে অধিক মনোযোগ দিতে পারে। এর ফলে জনস্বাস্থ্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে তা ভূমিকা রাখছে।

৩. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ : রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শক্তিশালী করেছে।

* **রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের অগ্রগতি:** জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনসহ নারীদের আসন প্রায় ২০.৮৬% (২০২২)। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদে ৩৩% আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত, যা স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী নেতৃত্বকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং উন্নয়ন প্রকল্পে নারী-দৃষ্টিকোণ যুক্ত করছে।

* **নীতিমালা ও জেন্ডার বাজেট:** National Women Development Policy (2011) ও Gender Budgeting Framework এর মতো গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলো নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ফলাফল, যা রাষ্ট্রের সম্পদ বণ্টনে নারীর অধিকারকে গুরুত্ব দেয়।

* **প্রশাসনিক পদে সীমিত উপস্থিতি:** যদিও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে, উচ্চ প্রশাসনিক পদগুলোতে (যেমন—উপসচিব থেকে সচিব) নারীর সংখ্যা ১% বা তারও কম এবং মোট অনুমোদিত সরকারি পদের মাত্র ৭.৬% নারী। উচ্চপদে এই স্বল্প উপস্থিতি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর পূর্ণ সক্ষমতা ব্যবহার করার পথে বড় বাধা।

৪. চ্যালেঞ্জ ও টেকসই ক্ষমতায়নের পথরেখা: নারীর ক্ষমতায়নকে আরও টেকসই ও গতিশীল করতে হলে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা এবং বাস্তবমুখী উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

* **মজুরি ও বৈষম্য দূরীকরণ:** একই কাজের জন্য নারী ও পুরুষের সমান বেতন নিশ্চিত করতে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে এবং শ্রমিক হিসেবে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

* **কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বীকৃতি:** নারীর প্রতি পারিবারিক সহিংসতা, অনাকাঙ্ক্ষিত হয়রানি এবং গৃহস্থালি শ্রমের স্বীকৃতির অভাব এখনো বড় বাধা। কর্মস্থলে ডে-কেয়ার সেন্টার ও নিরাপত্তা নীতিমালা কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে এবং গৃহিণীদের জন্য পেনশন সুবিধা চালুর মতো পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

* **উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত সহায়তা:** নারী উদ্যোক্তাদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ ও সহজ শর্তের অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে। প্রযুক্তি খাতে (Women in Tech) নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচির বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

* **সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন:** নারীর নেতৃত্ব ও কর্মসংস্থানকে মেনে নেওয়ার জন্য পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন আনা জরুরি। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে নারীর দক্ষতা ও সক্ষমতাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক সংস্কার ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেছে। নারীর এই উন্নতি এখন আর অনুগ্রহ নয়, বরং জাতীয় অগ্রগতির পূর্বশর্ত। ক্ষমতায়িত নারী শুধু নিজের জীবনেরই নয়, পুরো সমাজ ও জাতির পরিবর্তনের প্রতীক। বাংলাদেশের নারী সমাজকে আরও স্বাবলম্বী করে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে হলে, বৈষম্য দূর করে, তাদের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা অপরিহার্য। এটিই দেশের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য ভিত্তি, কারণ নারীর ক্ষমতায়ন হলো উন্নয়নের আত্মা।

৩. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ উল্লেখপূর্বক ভবিষ্যতে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ ধরে রাখতে কী ধরনের কূটনৈতিক ও নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন? পর্যালোচনা করুন।

নমুনা উত্তর : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ কেবল একটি সংখ্যাগত হিসাব নয়, বরং এটি বিশ্বশান্তি ও মানবতাবাদের প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকারের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় এবং দেশের বৈদেশিক নীতির এক অনন্য মাইলফলক। ১৯৮৮ সালে ইরান-ইরাক সামরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপে (UNIIMOG) ১৫ জন সেনা সদস্য পাঠানোর মধ্য দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা আজ বাংলাদেশকে বিশ্বমঞ্চে এক অপরিহার্য অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ঐতিহাসিকতা ও গৌরবময় অবদান-

দীর্ঘ ও ব্যাপক উপস্থিতি: বাংলাদেশ মে ২০২৫ পর্যন্ত সামরিক ও পুলিশ সদস্য মিলিয়ে মোট ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৫৬ জন শান্তিরক্ষী বিভিন্ন মিশনে মোতায়েন করেছে, যার মধ্যে ৩ হাজার ৩৮ জন নারী। এটি অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ সৈন্য প্রেরণকারী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং এই অবস্থান জাতীয় মর্যাদার প্রতীক।

সাহসিকতার দৃষ্টান্ত: বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে, যেমন—রুয়ান্ডার গণহত্যা (১৯৯৪), সোমালিয়া, এবং বসনিয়ার বিহাচ শহরে (যেখানে তারা ইউরোপীয় সেনাদের ব্যর্থতা সত্ত্বেও সাহসিকতার সঙ্গে গণহত্যা ঠেকাতে সক্ষম হন) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আন্তর্জাতিক মহলে আস্থা ও প্রশংসা অর্জন করেছেন।

বহুমাত্রিক ভূমিকা: পদাতিক ও সামরিক পর্যবেক্ষক ছাড়াও বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট, মেডিকেল ইউনিট এবং ইউটিলিটি এভিয়েশন ইউনিট (হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমানসহ) পাঠিয়েছে। নৌবাহিনী লেবাননে মেরিটাইম টাস্কফোর্সের অংশ হিসেবে অবৈধ অস্ত্র অনুপ্রবেশ রোধে এবং দক্ষিণ সুদানে মানবিক সাহায্য বহনে সহায়তা করছে।

নারী শান্তিরক্ষীর নেতৃত্ব: মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম—২০১০ সালে হাইতিতে নারী পুলিশের দল পাঠিয়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে। বর্তমানে ৩,০৩৮ জন নারী সদস্য সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন, যা বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে বেশি এবং ইউএন উইমেনের দৃষ্টিতে প্রশংসিত।

দেশের অর্থনীতি ও কূটনীতিতে বহুমাত্রিক প্রভাব-

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বাংলাদেশের জন্য সামরিক ও মানবিক অর্জনের পাশাপাশি কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সুবিধা এনেছে:

বিশাল বৈদেশিক মুদ্রা আয়: ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০২৫ পর্যন্ত সামরিক ও পুলিশ বাহিনী মিলিয়ে মোট আনুমানিক ৩২ হাজার কোটি টাকারও বেশি (প্রায় ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি) বৈদেশিক মুদ্রা দেশে এসেছে। এটি দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন এবং অর্থনীতির স্থিতিশীলতায় ভূমিকা রাখে।

সামরিক আধুনিকীকরণ: শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করার ফলে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তি, অস্ত্র পরিচালনা, সামরিক যান ও সরঞ্জাম ব্যবহারে আধুনিক দক্ষতা অর্জন করেছে। বিআইপিএসওটি (BIPSOT)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ দেশের সামরিক প্রশিক্ষণ মানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছে।

কূটনৈতিক সফলতা: আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলস্বরূপ বাংলাদেশ ৪২টি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে, যার অনেকগুলোই পিস কিপিংয়ের সময়কার যৌথ কার্যক্রমের ফল। এটি কৌশলগত কূটনীতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি: বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও মানবিক আচরণের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সহ আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা বারবার প্রশংসা করেছেন। সিয়েরা লিওনে বাংলা ভাষা জনপ্রিয় করা এবং ডিআর কঙ্গোতে নারী চিকিৎসক দলকে 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল কন্টিনজেন্ট' হিসেবে পুরস্কৃত করা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে সমুজ্জ্বল করেছে।

চ্যালেঞ্জ ও আত্মত্যাগ : এই গৌরবময় অধ্যায়ের বিপরীতে রয়েছে বিশাল আত্মত্যাগ ও চ্যালেঞ্জ:

আত্মত্যাগ ও ঝুঁকি: প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ১৬৮ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী শহীদ হয়েছেন এবং ২৬৬ জন সদস্য আহত হয়েছেন। এদের অনেকেই সন্ত্রাসী হামলা বা আইইডি বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন (বিশেষত কঙ্গো ও মালি মিশনে)।

পারিবারিক ও মানসিক চাপ: যুদ্ধক্ষেত্র সদৃশ পরিবেশে কর্মরত থাকায় মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, দীর্ঘ সময় পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে ২৫-৩০ শতাংশের বেশি সদস্যের মধ্যে দাম্পত্য কলহ ও বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে, যা সামাজিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

নৈতিক চ্যালেঞ্জ: শান্তিরক্ষীদের মধ্যে সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন অ্যান্ড এবিউজ (SEA)-এর মতো নৈতিক স্খলনের অভিযোগ মোকাবিলা করা একটি চলমান চ্যালেঞ্জ, যদিও বাংলাদেশি সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।

আপনার প্রদত্ত দুটি বিশ্লেষণই বাংলাদেশের বর্তমান নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ভবিষ্যতের কৌশলগত দিকগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। এই দুটি অংশকে একত্রিত করে, একটি সুসংগঠিত, তথ্যবহুল এবং ২০ নম্বরের উপযোগী চূড়ান্ত উত্তর নিচে উপস্থাপন করা হলো।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এক গৌরবোজ্জ্বল কূটনৈতিক অর্জন হলেও, গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগের কারণে এই অর্জন এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আন্তর্জাতিক মহল থেকে আসা সুনির্দিষ্ট ও কঠোর দাবিগুলো মোকাবিলা করে নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ ধরে রাখতে হলে আদর্শিক, কাঠামোগত ও কূটনৈতিক সংস্কার অপরিহার্য।

১. আন্তর্জাতিক মহলের সুনির্দিষ্ট দাবি ও চ্যালেঞ্জ : গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব ও সামরিক বাহিনীর কর্মকাণ্ড নিয়ে আন্তর্জাতিক মহল থেকে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট ও গুরুতর আহ্বানগুলো এসেছে।

* **পুলিশ প্রত্যাহারের আহ্বান:** জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগের কারণে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা থেকে পুলিশ বাহিনীকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

* **র‍্যাব বিলুপ্তির দাবি:** গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-কে বিলুপ্ত করার জোরালো দাবি উঠেছে।

* **গুম ও খুনে জড়িত সেনা সদস্যদের বিচার:** গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে জড়িত সেনা সদস্যদের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে স্বচ্ছ ও স্বাধীন তদন্তের মাধ্যমে বিচারের আহ্বান জানানো হয়েছে।

এই দাবিগুলো মোকাবিলা করাই এখন শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ধরে রাখার সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ।

২. চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অভ্যন্তরীন কাঠামোগত ও নীতিগত সংস্কার : শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ ধরে রাখতে হলে, অভ্যন্তরীণভাবে পুলিশ, র‍্যাব ও সেনাবহিনীতে নিম্নলিখিত জরুরি ও কাঠামোগত সংস্কার অপরিহার্য।

র‍্যাবের (RAB) জরুরি সংস্কার/পুনর্গঠন: র‍্যাবকে বিলুপ্তির দাবি সত্ত্বেও যদি এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকে, তবে এর ম্যান্ডেট কঠোরভাবে শুধুমাত্র সন্ত্রাস ও চরমপন্থা দমনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। র‍্যাবের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা ও মনিটরিং কাঠামোকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো স্বচ্ছ ও স্বাধীন তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

পুলিশ বাহিনীর সংস্কার: পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা, মানবাধিকার আইন ও জনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি কঠোরভাবে অন্তর্ভুক্ত করা। অভ্যন্তরীণভাবে কমিউনিটি-ভিত্তিক নিরাপত্তা মডেল (Community Policing) শক্তিশালী করে জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করা।

সেনাবাহিনীর স্বচ্ছ বিচারিক প্রক্রিয়া: গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বা অন্য কোনো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে জড়িত প্রত্যেক সেনা সদস্যের স্বচ্ছ ও স্বাধীন বিচার নিশ্চিত করা। এটি সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

৩. কৌশলগত কূটনৈতিক ও সামরিক পদক্ষেপ : অভ্যন্তরীণ সংস্কারের পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক আস্থা দ্রুত ফিরিয়ে আনতে এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত কৌশলগুলো গ্রহণ করা আবশ্যক।

ক. সামরিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি

* **বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও ইউনিট গঠন:** আধুনিক মিশনে চাহিদা অনুযায়ী সাইবার নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ইউনিটের প্রশিক্ষণ এবং দ্রুত মোতায়েনযোগ্য (Rapidly Deployable) কন্টিনজেন্ট (যেমন ইউএনপিসিআরএস-এর র্যাপিডলি ডিপ্লয়েবল লেভেল) বাড়াতে হবে। বিআইপিএসওটি (BIPSOT)-কে আরও উন্নত করা প্রয়োজন।

* **উচ্চ প্রযুক্তির সংযোজন:** উন্নত ড্রোন, রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি এবং সামরিক যানে অত্যাধুনিক সুরক্ষা গিয়ার যুক্ত করে শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ডিআর কঙ্গোতে হেলিকপ্টার মোতায়েন এবং পেরুকে বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়কারী যান প্রদানের মতো প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে।

* **নারী শান্তিরক্ষী বৃদ্ধি:** জাতিসংঘের লক্ষ্য (সামরিক কন্টিনজেন্টে ১৫% ও পুলিশ ইউনিটে ২০%) অর্জনের জন্য নারী শান্তিরক্ষীর সংখ্যা কৌশলগতভাবে বাড়াতে হবে এবং জেন্ডার সংবেদনশীল কার্যক্রমে তাদের দক্ষতা নিশ্চিত করা।

খ. কূটনৈতিক প্রভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

* **মানবাধিকারের প্রতি শূন্য সহনশীলতা প্রদর্শন:** বাংলাদেশ সরকারকে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট বিভাগ (DPO/DOS) এবং দাতা দেশগুলোর কাছে স্বেচ্ছায় অভ্যন্তরীণ সংস্কারের পরিকল্পনা জমা দিতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে শূন্য সহনশীলতা নীতি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করতে হবে।

* **উচ্চপদে প্রতিনিধিত্বের জন্য স্বচ্ছতা:** ফোর্স কমান্ডার বা পুলিশ কমিশনার পদে বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের নিয়োগের জন্য লবিং জোরদার করার সময়, তাদের নিরপেক্ষতা ও মানবিক অঙ্গীকারের প্রমাণ তুলে ধরা জরুরি।

* **ত্রিপক্ষীয় অংশীদারিত্ব ও ভেটো রাজনীতি মোকাবিলা:** জাতিসংঘ, বাংলাদেশ এবং দাতা দেশগুলোর (EU, USA) মধ্যে ত্রিপক্ষীয় (Tri-lateral) অংশীদারিত্ব প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। নিরপেক্ষতা ও ভেটোর রাজনীতি মোকাবিলায় অন্যান্য বৃহৎ শান্তিরক্ষী সরবরাহকারী দেশগুলোকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ কূটনৈতিক ফোরাম গঠন করা যেতে পারে।

* **নতুন ধরনের মিশনে আগ্রহ:** আফ্রিকার গতানুগতিক মিশনগুলোর পাশাপাশি ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা বা এশিয়ার নতুন এবং ছোট মিশনগুলোতে আগ্রহ দেখিয়ে বাংলাদেশের সক্ষমতার বৈচিত্র্য তুলে ধরা।

গ. মানবিকতা ও নৈতিকতার মানদণ্ড : নৈতিকতার মানদণ্ড: সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন অ্যান্ড এবিউজ (SEA) সহ যেকোনো নৈতিক সংকটের অভিযোগ মোকাবিলায় স্বচ্ছ তদন্ত এবং কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

* **মানসিক স্বাস্থ্য ও পারিবারিক সহায়তা:** যুদ্ধক্ষেত্র সদৃশ পরিবেশে কাজ করার ফলে সৃষ্ট মানসিক চাপ ও পারিবারিক সমস্যা মোকাবিলায় কাউন্সেলিং, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা নিশ্চিত করা।

* **ভাষা প্রশিক্ষণে জোর:** মিশনে মোতায়েনের আগে সদস্যদের ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি বা স্প্যানিশ ভাষা প্রশিক্ষণে জোর দেওয়া, যা মিশনের কার্যকারিতা বাড়াবে।

গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ধরে রাখার বিষয়টি আর কেবল সামরিক সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল নয়; এটি এখন অভ্যন্তরীণ নৈতিকতা, আইন এবং মানবাধিকারের প্রতি রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকারের চূড়ান্ত পরীক্ষা। পুলিশ প্রত্যাহারের, র‍্যাব বিলুপ্তির এবং গুম-খুনে জড়িত সেনা সদস্যদের বিচারের মতো দাবিগুলো মোকাবিলায় সাহসী ও কাঠামোগত সংস্কার গ্রহণ করা হলে, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে এবং বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে একটি অবিচল, নির্ভরযোগ্য এবং অপরিহার্য অংশীদার হিসেবে নিজের স্থান ধরে রাখতে পারবে।

৪. **বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় বৈদেশিক ঋণের ভূমিকা কতটা সহায়ক, আর কতটা নির্ভরশীলতার ঝুঁকি তৈরি করছে? যুক্তিসহ আলোচনা করুন।**

নমুনা উত্তর : বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় বৈদেশিক ঋণ একটি দ্বিমুখী তলোয়ারের মতো কাজ করছে—যা একদিকে প্রবৃদ্ধি ও বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণে সহায়ক শক্তি, অন্যদিকে অর্থনীতিতে নির্ভরশীলতা ও ঋণের চাপ তৈরি করছে। আপনার প্রদত্ত বিস্তারিত তথ্য ও গভীর বিশ্লেষণকে একত্রিত করে, বৈদেশিক ঋণের ভূমিকা ও এর ঝুঁকি নিয়ে একটি সুসংগঠিত আলোচনা নিচে উপস্থাপন করা হলো।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রা: বৈদেশিক ঋণ—সহায়ক শক্তি বনাম নির্ভরশীলতার ঝুঁকি : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিশেষ করে অবকাঠামো উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জন্য বৈদেশিক ঋণ অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে। তবে, এই ঋণের পরিমাণ ও পরিশোধের চাপ বৃদ্ধির কারণে অর্থনীতি বর্তমানে এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। বিশেষ করে গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে সুবিধাবাদী পুঁজিবাদের আধিপত্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এই ঝুঁকিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

১. বৈদেশিক ঋণের সহায়ক ভূমিকা ও কৌশলগত ব্যবহার :

বৈদেশিক ঋণ দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের সীমাবদ্ধতা পূরণে সহায়তা করে এবং নিম্নলিখিত উপায়ে উন্নয়নে গতি যোগায়:

বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণ: পদ্মা সেতু, ঢাকা মেট্রোরেল (এমআরটি), রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো মেগা প্রকল্পগুলোর অর্থায়নে বৈদেশিক ঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যা দেশের যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও শিল্পায়নের ভিত্তি তৈরি করেছে। এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক খাত: বিশ্বব্যাংক (IDA), এডিবি এবং অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীর ঋণ স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে সহায়তা করে, যা মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ।

বৈদেশিক মুদ্রার ভারসাম্য: রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহে ঘাটতি দেখা দিলে বৈদেশিক ঋণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করতে এবং আমদানির ক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

প্রযুক্তিগত স্থানান্তর: ঋণের মাধ্যমে প্রায়শই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতা দেশে আসে, যা সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

২. ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার ঝুঁকি ও ঋণ-ফাঁদের আশঙ্কা-

ঋণের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতা ও ঋণের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, যা টেকসই উন্নয়নকে হুমকির মুখে ফেলছে:

ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা ও পরিশোধের চাপ: ২০২৪ সালের মার্চে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১০৪.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ঋণ পরিশোধের পরিমাণ (Debt Servicing) প্রতি বছর বাড়ছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে। ২০২৬ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসেই বৈদেশিক ঋণ পরিষেবায় বাংলাদেশের ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৬৬৭.১১ মিলিয়ন ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারকে ৪.১৮ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হবে।

ঋণ-ফাঁদের প্রবণতা: নতুন ঋণ নিয়ে পুরনো ঋণ শোধ করার প্রবণতা (ঋণ পুনঃঅর্থায়ন) বা 'ঋণপঞ্জি প্রক্রিয়া' তৈরি হচ্ছে, যেখানে অর্থনৈতিক উৎপাদন বা রাজস্ব বৃদ্ধির পরিবর্তে সাময়িক স্বস্তি খোঁজা হচ্ছে। এটি ঋণের অন্তর্নিহিত দেউলিয়াত্বকে ঢেকে রাখে।

সুবিধাভোগী পুঁজিবাদ ও দুর্নীতি: ঋণের প্রধান ঝুঁকি কেবল পরিমাণ নয়, বরং ব্যবহারের ধরন ও দুর্নীতি। ঋণচুক্তি, বাস্তবায়ন ও তদারকির প্রতিটি ধাপে অনিয়ম বিদ্যমান। তথাকথিত মেগা প্রকল্পের প্রধান সুবিধাভোগী ধনী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী হলেও ঋণ পরিশোধের ভার সাধারণ জনগণের, যা মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

ঋণদাতা দেশের স্বার্থ ও অতিরিক্ত ব্যয় : দ্বিপাক্ষিক ঋণের ক্ষেত্রে (যেমন জাইকা, চীন, ভারত, রাশিয়া), ঋণদাতা দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ, কাঁচামালের নিরাপত্তা ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পায়। শর্ত সাপেক্ষে তাদেরই ঠিকাদার নিয়োগ, পরামর্শক সেবা ও পণ্য ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা থাকে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের মেট্রোরেল নির্মাণ ব্যয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি হচ্ছে, যা জনগণের অর্থে অন্য দেশের ব্যবসা সম্প্রসারণ করছে।

এলডিসি উত্তরণ ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ : ২০২৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে (LDC) পরিণত হলে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া কঠিন হবে। তখন বাণিজ্যিক ঋণের উচ্চ সুদের হার পরিশোধের চাপকে আরও বাড়িয়ে দেবে।

কাঠামোগত দুর্বলতা : দেশের কর-জিডিপি অনুপাত মাত্র ৭.৪ শতাংশ, যা বিশ্বের সর্বনিম্ন পর্যায়ে। রাজস্ব আহরণের এই দুর্বলতা সরকারের ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ায় এবং ঋণ পরিশোধের সক্ষমতাকে সীমিত করে।

৩. যুক্তিসঙ্গত আলোচনা ও টেকসই সমাধানের পথ: বৈদেশিক ঋণ বাংলাদেশের জন্য সহায়ক না নির্ভরশীলতার ঝুঁকি—তা নির্ভর করে ঋণ ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার ওপর।

কার্যকর ঋণ ব্যবস্থাপনা : আইএমএফের নজিরবিহীন সীমা নির্ধারণ (২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৮.৪৪ বিলিয়ন ডলার) ইঙ্গিত করে যে দেশের ঋণ টেকসইতা ঝুঁকিপূর্ণ। এই ঝুঁকি মোকাবিলায় "কোয়ার্টারলি ডেট সাসটেইনেবিলিটি অ্যানালাইসিস" চালু করা জরুরি। ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বাড়ানো এবং লাভজনক ও উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা অপরিহার্য।

ঋণ গ্রহণের নীতি সংস্কার : ঋণদাতা দেশের স্বার্থের পরিবর্তে দেশের নিজস্ব প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে ঋণ গ্রহণ করতে হবে। ঋণের শর্তে এমন শর্ত গ্রহণ করা যাবে না যা ঠিকাদার নিয়োগে প্রতিযোগিতা ক্ষুণ্ন করে বা প্রকল্পের খরচ অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেয়।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ: ঋণের ওপর নির্ভরতা কমাতে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে। কর কাঠামো সংস্কার, স্বচ্ছতা বজায় রেখে এবং কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করে কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

দুর্নীতি নির্মূল: বৈদেশিক ঋণের অর্থায়নকৃত প্রকল্পগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সুবিধাভোগী পুঁজিবাদ (Cronie Capitalism) নির্মূল করা আবশ্যক, যাতে ঋণের অর্থ জনকল্যাণে ব্যবহৃত হয়, ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চয়ে নয়।

পরিশেষে বলা যায়, বৈদেশিক ঋণ যদি পরিকল্পিত, সুচিন্তিত এবং উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয় এবং পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বৃদ্ধি ও দুর্নীতি নির্মূলের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা নিশ্চিত করা যায়, তবেই এটি টেকসই উন্নয়নের মূল হাতিয়ার হবে। অন্যথায়, এই ঋণ দেশের দীর্ঘদিনের উন্নয়ন অর্জনকে "ঋণ-ফাঁদে" আবদ্ধ করে দেবে।

৫. **"বাংলাদেশের রাজনীতিতে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায়, স্বাধীন গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজ কোন কৌশলগত উপায়ে একটি 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করতে পারে?" মতামত দিন।**

নমুনা উত্তর : বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও উন্নয়নকে টেকসই করতে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা অপরিহার্য। এই প্রক্রিয়ায় স্বাধীন গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজ একসাথে একটি কার্যকর চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে—যেখানে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করে, জনগণকে সচেতন করে তোলে এবং প্রশাসনের প্রতি জবাবদিহি নিশ্চিত করে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান (২০২৪)-এর পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই বিষয়টি নতুন মাত্রা পেয়েছে। দীর্ঘ ১৫ বছরের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসানের পর নাগরিকদের আন্দোলন, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে সংঘটিত ঐ গণ-অভ্যুত্থান, দেশের রাজনীতি, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের ভূমিকা পুনর্নির্ধারণ করেছে। এই অভ্যুত্থান দেখিয়েছে—যখন জনগণ সংগঠিত ও তথ্যসচেতন হয়, তখন তারা পরিবর্তনের শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর গণতন্ত্র পুনর্গঠনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়, তাতে স্বাধীন গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজকে "জনগণের চোখ ও কণ্ঠস্বর" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার এজেন্ডায় মিডিয়ার স্বাধীনতা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণকে প্রধান নীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সময় অনেক গণমাধ্যম আবারও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন শুরু করে, দুর্নীতি, রাজনৈতিক দমন, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি নিয়ে নতুন করে আলোচনায় আসে। একইভাবে, সুশীল সমাজ—বিশেষ করে মানবাধিকার ও নাগরিক সংগঠনগুলো—সংবিধান সংস্কার, নির্বাচনী ব্যবস্থার স্বচ্ছতা, এবং নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

স্বাধীন গণমাধ্যমের ভূমিকা :

গণমাধ্যম গণতান্ত্রিক সমাজের প্রাণশক্তি। এটি তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করে, রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে এবং নাগরিকদের সচেতন করে তোলে। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স (RSF)-এর "World Press Freedom Index 2025" অনুযায়ী বাংলাদেশ ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৯তম স্থানে উঠেছে (২০২৪ সালে ছিল ১৬৫তম)। যদিও এটি ইতিবাচক ইঙ্গিত দেয়, তবুও সাংবাদিকদের উপর মামলা ও ভয়ভীতি অব্যাহত রয়েছে। ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে প্রায় ২১,৮৬৭টি মামলা হয়, যাদের মধ্যে অন্তত ১৪২ জন সাংবাদিক অভিযুক্ত হন। এসব তথ্য দেখায় যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা এখনো ঝুঁকির মধ্যে, যা সরাসরি জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থার প্রতিবন্ধক।

তবুও জুলাই বিপ্লব-পরবর্তী সময় গণমাধ্যমের জন্য ছিল একটি পুনর্জাগরণের মুহূর্ত। সেন্সরশিপ কমে আসে, স্বাধীন অনলাইন পোর্টাল ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলো নতুনভাবে সামাজিক জবাবদিহি তৈরি করতে শুরু করে। গণমাধ্যম এখন শুধু খবর দেয় না—বরং জনমত গঠন, সংস্কার প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ, এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের সমালোচনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

সুশীল সমাজের ভূমিকা : সুশীল সমাজ, যেমন মানবাধিকার সংগঠন, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাবিদ ও তরুণ প্রজন্ম—রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রচনা করে। তারা নাগরিক অধিকার রক্ষায় কাজ করে, সরকারি নীতির ওপর নজর রাখে এবং বিকল্প চিন্তাধারার পরামর্শ দেয়। জুলাই বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে তারা গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রক্রিয়ায় অন্যতম চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। তারা নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন, প্রশাসনিক সংস্কার, এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছে। একই সঙ্গে, তারা নাগরিক সমাজকে সংগঠিত করছে—যাতে জনগণ শুধু ভোটদাতা নয়, বরং সক্রিয় "গভর্নেন্স অংশীদার" হয়ে ওঠে।

চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের বাস্তব প্রয়োগ :

স্বাধীন গণমাধ্যম অনিয়ম প্রকাশ করে, সুশীল সমাজ সেই তথ্যের ভিত্তিতে সচেতনতা ও চাপ সৃষ্টি করে—এভাবেই রাষ্ট্রে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি হয়। গণমাধ্যম সরকারের কাজকে স্বচ্ছ রাখে, সুশীল সমাজ নাগরিকদের সক্রিয় করে তোলে, আর এই দুই শক্তি একত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জবাবদিহি সৃষ্টি করে। এর ফলেই নাগরিকরা ক্ষমতায়িত হয়, এবং গণতন্ত্র কেবল তাত্ত্বিক ধারণা নয়, বাস্তব প্রক্রিয়া হিসেবে বিকশিত হয়।

তবে চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এখনও কিছু মিডিয়া রাজনৈতিক প্রভাবাধীন; সুশীল সমাজের অর্থনৈতিক নির্ভরতা তাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করে। ডিজিটাল মিডিয়ায় ভুয়া তথ্য, সরকার-নিয়ন্ত্রিত বর্ণনা ও অনলাইন সেন্সরশিপ নতুন প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি মোড় পরিবর্তনের মুহূর্ত। এটি দেখিয়েছে যে জনগণই গণতন্ত্রের আসল শক্তি। এই আন্দোলনের পর স্বাধীন গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজ নতুন দায়িত্ব নিয়ে উদীয়মান—তারা এখন শুধু রাষ্ট্রের সমালোচক নয়, বরং রাষ্ট্রগঠনের সহযাত্রী। গণমাধ্যম সত্য তুলে ধরে, সুশীল সমাজ তা নাগরিক আন্দোলনে রূপ দেয়—ফলে গড়ে ওঠে এক কার্যকর "চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স" ব্যবস্থা। এই সমন্বয়ই পারে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও নাগরিকক্ষমতাভিত্তিক নতুন বাংলাদেশের ভিত্তি গড়ে তুলতে।